বিংশ শতাব্দীর আশার পরিবেশে এই নয়া ব্যবস্থার সূচনা হলেও তা পুরানো ব্যবস্থার থেকে খুব তফাৎ ছিল না ("Actually, the new order was not so different from the old as if seemed in the atmosphere of hope that ushered in the present century"—Palmer and Perkins.)। তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে "মোটের উপর 'গণতান্ত্রিক কূটনীতি' নিয়ে অভিজ্ঞতা হতাশাব্যাঞ্জক" ("On the whole experience in 'democratic diplomacy' has been disappointing"—Palmer and Perkins.)। নয়া কূটনীতি জনগণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে প্রায় সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সম্ভ্রম কমে গেছে আর সারা দেশের মানুষ কূটনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাচনা করার ফলে কূটনীতির অন্তর্নিহিত গভীরতা ও গাম্ভীর্য হারিয়ে গেছে। পামার এবং পারকিনস বলেছেন যে প্রায়ই এই কূটনীতি বাজারের কূটনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে, এমনকি তা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণের কূটনীতি—অর্থাৎ এমন সব পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না ("To often it has been associated with the diplomacy of the marketplace, or even plebiscitary diplomacy—that is, with conditions under which important and delicate negotiations between states cannot possibly be conducted with success"—Palmer & Perkins.)। হ্যারল্ড নিকোলসন তাঁর Diplomacy গ্রন্থে গণতান্ত্রিক কূটনীতি নামে নয়া কূটনীতির ব্যর্থতার তিন ধরনের কারণ উল্লেখ করেছেন—এক, 'সার্বভৌম জনগণের দায়িত্বহীনতা' ("the irresponsibility of the sovereign people")— অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সার্বভৌমতার অধিকারী জনগণ কূটনীতি নিয়ে অসার্থক আলোচনা করে যাতে কূটনীতির ধার কমে যায়, দুই, জনগণের অজ্ঞতা—যে অজ্ঞতার কারণ তথ্যের অভাব নয় কারণ মিডিয়া (media) বা গণমাধ্যমগুলির ভেতর দিয়ে প্রচারিত তথ্যের অভাব নেই; তবুও অজ্ঞতার কারণ দেশের গার্হস্থ্য বিষয়ে জনগণ যে ধ্যান দেয় পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির বিষয়ে সে ধ্যান তারা দেয় না, ; তিন, জনগণের বিশেষ ধরনের বোধ ও বিশ্বাস প্রসূত জ্ঞান যার থেকে জনগণ কোন বিষয়ে অতটা জেনে বা না-জেনে মন্তব্য করে, আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি শুরু করে দেয়। দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রশাসকরা ('responsible statesmen) নীরব হয়ে যান। আধুনিক কূটনীতি অত্যন্ত বেশী খোলাখুলি হওয়ার ফলে পণ্ডিতম্মন্য মানুষের ভিড় বেড়ে গেছে। কূটনীতি নিরন্তর সমালোচনার মুখে পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই সব পণ্ডিতম্মন্য মানুষদের নিকোলসন "Crackerbarrel philosophers" বলেছেন। জনগণতান্ত্রিকতার জোয়ারে এদের হাতেই নয়া কূটনীতি তার মর্যাদা হারাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

৪(খ).৮ পুরানো কূটনীতি বনাম নয়া কূটনীতি ঃ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

হ্যারল্ড নিকোলসন (Harold Nicolson) পুরানো কূটনীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। এক, এই কূটনীতিতে মনে করা হত যে ইউরোপ হচ্ছে সমস্ত মহাদেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান ; দুই এতে মনে করা হত যে বৃহৎ শক্তিগুলি ক্ষুদ্রশক্তিগুলি থেকে বৃহত্তর— the Great Powers are greater than small powers ; তিন, এই রকম একটি বোধ পাশ্চাত্য কূটনীতিতে সংক্রামিত হয়েছিল যে ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে পরিচালিত করা বৃহৎ শক্তিগুলির সাধারণ বা সম্মিলিত দায়িত্ব (common responsibility) ; চার, ইউরোপের প্রত্যেক দেশে একই ধাঁচে কূটনৈতিক পরিষেবা (diplomatic service on a more or less identical model) গঠন; পাঁচ, এই নিয়ম (rule) যে সমস্ত আলোচনা হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন ও গোপন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি

প্রায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। তবুও নয়া কূটনীতির আমদানি করতে হল। এর প্রেক্ষাপটে তিনটি জিনিষ প্রধান— এক, উপনিবেশিক বিস্তারের ইচ্ছা ও তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা ইউরোপের প্রায় সব দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব ফেলেছিল; দুই, উদগ্র বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা যার ফল হিসাবে যুক্ত হয়েছিল বাজার অধিকার করার উৎকট বাসনা; তিন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি ও গতিবৃদ্ধি। এর সমস্ত কিছুর সাথে জড়িত ছিল অন্তরালের ক্রমবর্ধমান ভিন্ন একটি শক্তি— শিল্প বিপ্লব। এই সমস্ত কিছুর ফলে পুরানো কূটনীতি বদলিয়ে নতুন কূটনীতির আবির্ভাব ঘটছিল। হ্যারল্ড নিকোলসন বলেছেন যে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল ১৯১৯ সালের প্রায় একশত বছর আগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাম্যবাদ (egalitarianism) এবং লয়েড জর্জের বৈঠকের মধ্য দিয়ে কূটনীতির ধারণাই (Diplomacy by Conference) নয়া কূটনীতির জন্য একমাত্র দায়ী ঘটনা নয়। একটা বিরাট ঐতিহাসিক ধারা অনেক দিন ধরেই কাজ করছিল। নয়া কূটনীতি এই ধারা জনিত পরিবর্তনের ফল। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ঐতিহাসিক ধারার মধ্য থেকে উঠে আসলেও নয়া কূটনীতির মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা সুষ্ঠু কূটনীতির গঠনের ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাম্যবাদের (egalitarianism) ফলেই হোক বা অন্য যে কোন প্রক্রিয়াজনিতই হোক আজকের পৃথিবীতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বড় বা ছোট সমস্ত দেশই সমান। হ্যারল্ড নিকোলসন বলেছেন যে যেমন সমস্ত মানুষ সমান সেইরকম সমস্ত রাষ্ট্র সমান একটি প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, আর তা হল 'লবি' বা দল গঠনের প্রবণতা। আর এই লবিগুলির উদ্দেশ্য হল বৃহৎ শক্তিগুলির যে কোন প্রস্তাব তা যদি যুক্তিসঙ্গতও হয় তার বিরোধিতা করা ("The theory that all states are equal, even as all men are equal, had led to lobbies being formed among the smaller countries ... the sole unifying principle of which is to offer opposition even to the reasonable suggestions of the Great Powers"—Harold Nicolson)।

৪(খ).৯ নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা

১৯৭২ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত **মর্ডান ডিপ্লোমেসি ঃ পিরিন্সিপালস, ডকুমেন্টস, পিওপেল** গ্রন্থে কে. এ্যানাটোলিয়েভ (K. Anatoliev, *Modern Diplomacy : Principles, Documents, People*) নয়া কূটনীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায়ই পুরানো কূটনীতি ও নয়া কূটনীতি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকেন। একথা ঠিক যে [বিংশ শতাব্দীর] বিগত পঞ্চাশ বছরে কূটনীতির প্রকরণ ও হাতিয়ারের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে যা তালেরাঁ (Talleyrand) এবং বিসমার্কের (Bismarck) কূটনীতির এবং আমাদের কূটনীতির মধ্যে একটা সরল বিচ্ছেদ রেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু যে সংজ্ঞার ওপর এই বিভাজন টানা হয়েছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। কারণ তা বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে মুছে দিয়েছে। আর তা হল কূটনীতির সামাজিক চরিত্র ("the social nature of diplomacy")। কে. এ্যানাটোলিয়েভ (K. Anatoliev) বলেছেন যে নয়া কূটনীতির (New Diplomacy) মধ্যে একটা রাজনৈতিক কলা আছে যা হ্যারল্ড নিকোলসনের দ্য এভোনিউশন অভ ডিপ্লোমেটিক মেথড (Harold Nicolson : The Evolution of Diplomatic Method) গ্রন্থে স্পষ্ট হয়েছে। ["Writers on foreign policy frequently use the terms Old Diplomacy and New Diplomacy. It is, of course, all too true that in the last half century or so there have been changes in the methods and devices of

diplomacy of Talleyrand and Bismarck and the diplomacy of our time. Those definitions cannot, however, claim to be scientifically accurate since they obliterate the substance of the matter : the social nature of diplomacy. Nonetheless the polemical barbs levelled against the New Diplomacy have a very obvious target. This point is easily proved on the example of Harold Nicolson's *The Evolution of Diplomatic Method*'—K. Anatoliev]

নিকোলসন নয়া কূটনীতির জনক হিসাবে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে (Woodrow Wilson) চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে ভার্সাই সম্মেলনের সময় (১৯১৯) তিনি যে খোলা কূটনীতির কথা বলেছেন তা হল 'মার্কিন পদ্ধতি' ('The American Method') যাকে পুরানো কূটনীতির গ্রীক, ইটালীয় ও ফরাসী পদ্ধতির থেকে আলাদা করা যায়। এইখানেই কে. এ্যানাটোলিয়েভের আপত্তি। তিনি বলেছেন যে এটি বিস্ময়কর যে তিনি খোলা কূটনীতির (Open diplomacy) প্রথম সম্ভাষণ খুঁজে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসনের চতুর্দশ শর্তের সেই শর্তে যেখানে তিনি বলেছেন যে কূটনীতি অগ্রসর হবে প্রকাশ্যে ও জনগণের দৃষ্টির সামনে—'diplomacy should proceed always and frankly and in the public view'। নিকোলসনের দৃষ্টি পড়েনি সোভিয়েট সরকারের প্রথম পররাষ্ট্রনীতি দলিলে, তাদের 'শান্তির ঘোষণায়' (Decree on Peace)। এইটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই দলিল যা ইতিহাসে সর্বপ্রথম "সমস্ত জনগণের সামনে এবং প্রকাশ্যে আলাপ আলোচনা চালানো একটি দৃঢ় ইচ্ছা" প্রকাশ করেছিল ("It may seem a bit strange that Harold Nicolson should refer to president Wilson's Fourteen Points instead of addressing himself to the first foreign policy act of the Soveit Government, the Decree on Peace. It was precisely that document which expressed for the first time in History, 'a firm intention ot conduct all negotiations quite openly and before the entire people'—K. Anatoliev)। আর সেই ইচ্ছাকে তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত করেছিল নয়া কূটনীতির পদ্ধতিকে কার্যকরী করে। এইভাবে কার্যকরী করার পথেই তারা জার সরকারের (Tsarist Government) সমস্ত গোপন সন্ধি ও চুক্তি প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের (The Provisional Governments) গোপন কূটনৈতিক কাগজপত্রও জনসমক্ষে এনে দিয়েছিল। এ্যানাটেলিয়েভ বলেছেন যে ১৯১৭ সালের ২২ নভেম্বর সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিষয়ক জনগণের কমিসারিয়েট (People's Commissariat for Foreign Affairs) যে ঘোষণা করেছিল তাই হল খোলা কূটনীতির প্রথম মুক্ত ঘোষণা, নয়া কূটনীতির নতুন ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে "গোপন কূটনীতির নিষিদ্ধ হওয়া হল জনমুখী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্নিহিত সততার প্রথম বনিয়াদী শর্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতির অনুসরণ করাকে সোভিয়েট সরকার তার পালনীয় কাজ বলে নেনে নিয়েছে" (The abolition of secret diplomacy is a primary conditions of honesty in a popular and truly democratic foreign policy. To pursue that policy in practice is the task the Soviet Government sets ifself.")।

এ্যানাটোলিয়েভ বলেছেন যে হ্যারল্ড নিকোলসন নয়া কূটনীতির সমর্থক নন। অতএব এই মার্কিন কূটনীতির জনক হিসাবে উড্রো উইলসনকে চিহ্নিত করে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সামনে খাড়া রেখে পেছনে সোভিয়েত মুক্ত কূটনীতি, খোলা দেওয়া-নেওয়ার সমালোচনা করেছেন। নয়া কূটনীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পায়নি এবং এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পুরোধা হিসাবে হ্যারল্ড নিকোলসনও তাকে সমাদর করতে পারেননি। তিনি তাঁর আক্রমণের আপাত বিষয় করেছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসনের নীতিকে এবং উহ্য রেখেছিলেন মুক্ত দুনিয়ার অঙ্গীকার সোভিয়েত শান্তি ইস্তাহারকে। যেহেতু এই ইস্তাহারই একটি প্রাথমিক দলিল তা ধরে

নিতে হবে নিকোলসন প্রত্যক্ষভাবে নয়া মার্কিন কূটনীতিকে এবং পরোক্ষভাবে অলঙ্ঘ্য সোভিয়েট মুক্ত দুনিয়ার ঘোষণাপত্রকে তিরস্কার করেছেন।

৪(খ).১০ সারাংশ

সভ্যতা তার অগ্রগতির ইতিহাসে পাঁচরকম কূটনীতির জন্ম দিয়েছে—তা হল গ্রীক, রোমান, ফরাসী, ইটালীয় ও মার্কিন কূটনীতি। এর মধ্যে মার্কিন কূটনীতি একটু ভিন্ন ধরনের। আগের কূটনীতি হল পুরানো কূটনীতি যার মূল বিষয় ছিল গোপনীয়তা—জনগণের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক দেওয়া-নেওয়া যাবতীয় তথ্যকে লুকিয়ে রাখা। এটি হল অভিজাততান্ত্রিক কূটনীতি। এই কূটনীতির ফলেই ঘটে গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে মানুষ এই কূটনীতি থেকে সরে এল। আত্মপ্রকাশ করল নয়া কূটনীতি জনগণতান্ত্রিক কূটনীতি। ১৯১৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তের মধ্যে খোলা (open) কূটনীতির প্রতিশ্রুতিকে ঘোষণা করলেন। এর আগেই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকার তাদের শান্তির ইস্তাহারে এই ঘোষণাটিই করেছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে ভয়মুক্ত শান্তির ললিত আশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়া হল নয়া কূটনীতির কাঠামো খোলা দেওয়া-নেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে। এক সময়ে পৃথিবীতে জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের পর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হানাহানি থেকে সনাতন কূটনীতির গোপনীয়তার ভাবটি এসেছিল। এখন এই খোলা কূটনীতির ধারণা হয়ে দাঁড়াল পুরাতন জাতীয় রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে পুরাতন থেকে নয়া কূটনীতির পরিবর্তন তা একদিনে হয়নি। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির প্রায় একশত বছর আগে থেকে ইউরোপে যে সমস্ত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তারই মধ্যে লুকিয়েছিল এই রূপান্তরের বীজ। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট সরকার বা ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন শুধু এই রূপান্তরের পরিণতি পর্বের মেরুবিন্দুকে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে নয়া কূটনীতির প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন কূটনীতিবিদরা, আড়ালে থাকে সার্বভৌম জনগণ। তাদের জনমত কূটনীতির ধারাকে প্রভাবিত করে। এই জনগণের অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ি, তাদের মোহ এবং উচ্ছ্বাস যা গণমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তা অনেক সময়ে কূটনীতির সাবলীল গতি রুদ্ধ করে। তার ফলে আধুনিক কূটনীতি বা নয়া কূটনীতি যা খোলামেলা হতে গিয়ে অনেক সময়ে অত্যন্ত বেশী খোলামেলা হয়ে পড়ে তা পরিণতিতে সার্থকভাবে কার্যকর হয় না। নয়া কূটনীতির ব্যর্থতা এইখানে।

৪(খ).১১ প্রশ্নাবলী

১. *দশটি* বাক্যে উত্তর দিন

ক) সনাতন কূটনীতির পর্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) নয়া কূটনীতি কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

গ) সনাতন কূটনীতির দুর্বলতা কি?

ঘ) নয়া কূটনীতির দুর্বলতা কি?

ঙ) নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের পেছনে সোভিয়েত রাশিয়ার অবদান কি?

চ) কূটনীতির ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ছ) নয়া কূটনীতি কি সার্থক?

জ) সনাতন কূটনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

ঝ) আধুনিক কূটনীতি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতটি কি?

ঞ) গণতান্ত্রিক কূটনীতি কি?

২. *পাঁচটি* বাক্যে উত্তর দিন।

ক) আমরা কূটনীতির ইতিহাস পড়ব কেন?

খ) কূটনীতির বিবর্তনে জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা কি?

গ) কূটনীতির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মত আলোচনা করুন।

ঘ) কূটনীতির ইতিহাসে কার্ডিনাল রিশলে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ঙ) নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের কারণ কি?

চ) গোপন কূটনীতির বিপরীত কূটনীতি কি? তা বিখ্যাত কেন?

ছ) আধুনিক কূটনীতিতে সার্বভৌম জনগণের ভূমিকা কি?

জ) নয়া কূটনীতির ত্রুটি হার্টম্যান (Hartmann) কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

ঝ) নয়া কূটনীতি নিয়ে হার্টম্যান ও মরগেনথোর (Morgenthau) মধ্যে চিন্তাধারার কি কোন বিরোধ আছে?

ঞ) 'কূটনীতির পতন' কি?

৩. *পনেরোটি* বাক্যে উত্তর দিন।

ক) খোলা কূটনীতি (Open Diplomacy) ও গোপন কূটনীতির (Secret Diplomacy) বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।

খ) নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা বলতে কি বোঝায়?

গ) রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে কি নয়া কূটনীতির জনক বলা যায়?

ঘ) চৌদ্দ দফা শর্তের কোন শর্তকে বা কোন্ কোন্ শর্তকে নয়া কূটনীতির প্রারম্ভিক সূচনা বলা যেতে পারে এবং কেন তা গ্রাহ্য বলে মনে হয়?

ঙ) পুরানো কূটনীতির বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা করুন।

চ) হ্যারেল্ড নিকোলসন (Harold Nicolson) এর মতবাদ সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী পর্যালোচনা কি?

ছ) উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার অভ্যুদয় কিভাবে হয়েছিল?

জ) নয়া কূটনীতি কতটা নতুন?

ঝ) গোপন কূটনীতির অভ্যুদয়ে বিসমার্কের অবদান কি?

ঞ) নয়া কূটনীতি কি সার্থক কূটনীতি?

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১. Harold Nicolson, *The Evolution of Diplomatic Method.*

২. Harold Nicolson, *Diplomacy.*

৩. K. Anatoliev, *Modern Diplomacy : Principles, Documents, People.*

৪. Machiavelli, *The Prince.*

৫. D. M. Ketelbey, *A History of Modern Times.*

৬. David Thompson, *Europe since Napoleon.*

৭. E. Lipson, *Europe in the 19th & 20th Centuries.*

৮. Frederick H. Harmann, *The Relations of Nations.*

৯. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace.*

১০. Norman D. Palmer and Howard C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition.*

১১. Rene 'Albrecht Curric', *Diplomatic History of Europe.*

একক ৪(গ) ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

গঠন

৪(গ).০ উদ্দেশ্য

৪(গ).১ প্রস্তাবনা

৪(গ).২ প্রারম্ভিক কথা

৪(গ).৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত

৪(গ).৪ বলকান জাতীয়তাবাদ

৪(গ).৫ আন্তর্জাতিক সংকট : হেগ কনফারেন্স থেকে বলকান যুদ্ধ

৪(গ).৬ ওয়েল্টপলিটিক ও নৌবাদ

৪(গ).৭ প্রাচ্য সমস্যা : সোরাজেভো হত্যাকাণ্ড : প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা

৪(গ).৮ যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র

৪(গ).৯ জার্মানির নৌযুদ্ধ

৪(গ).১০ যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ

৪(গ).১১ যুদ্ধের দায়িত্ব

৪(গ).১২ যুদ্ধ শেষের প্রস্তুতি : উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত

৪(গ).১৩ ১৯১৯ সালের শান্তি ব্যবস্থা

৪(গ).১৪ ফলাফল

৪(গ).১৫ সারাংশ

৪(গ).১৬ প্রশ্নাবলী

৪(গ).১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪(গ).০ উদ্দেশ্য

যুদ্ধ, মানুষের সনাতন প্রতিষ্ঠান, তার সবচেয়ে প্রাচীনতম অভিশাপগুলির একটি। যুদ্ধ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে, উন্নয়ন ব্যাহত করে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়। মানুষকে ধ্বংস করা, সম্পত্তির বিনাশ ঘটানো আরেক নাম যুদ্ধ যার পরিণতি হল দেশের সাথে দেশের শত্রুতা, জাতির সাথে জাতির বৈরিতা, আর গার্হস্থ্য অস্তিত্বে রোগ শোক-অর্থভাব অন্নাভাব ও কর্মহীনতার প্রকোপ বৃদ্ধি। যুদ্ধ কোনদিন মানুষের শুভ শক্তি হতে পারে না। এই সত্য আমরা আশৈশব জেনে আসি নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ সত্যের

যে ভুবনায়িত রূপ তার global perspective— আমরা এই এককের মধ্যে দিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখব কেমন করে পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদ—যাকে আমরা বলকান জাতীয়তাবাদ বলে থাকি—সেই জাতীয়তাবাদের ধারা কি বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছিল যাকে প্রশমন করা পশ্চিমী শক্তিগুলির পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। আর দেখব সমস্ত ইউরোপীয় মহাদেশ দুটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যার ফলে আসন্ন ঝড়ের অশনি সংকেত বিশ্বময় সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল—সাম্রাজ্যবাদের লোভ আর হানাহানি গ্রাম করতে চাইছিল মানুষের গোটা সভ্যতার দুনিয়া জোড়া রূপটিকে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত নানা রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—বনাম অক্ষশক্তি—জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালি— এই তিন দেশের ঐক্যবদ্ধ লড়াই এমন এক বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় এনে দিয়েছিল যার প্রভাব বহুদেশের স্থিতিশীলতাকে নড়িয়ে দিয়েছিল, এই বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতেই রাশিয়ার জারতন্ত্রের ভিত নড়ে গিয়েছিল, জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লীগ অফ নেশনস্ নামে এক অভিনব বিশ্বসংগঠনের জন্ম হয়েছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল হাঙ্গেরি, ইউগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভ্যাকিয়া প্রভৃতি দেশ। ইউরোপের পুরানো মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল—আর পরিবর্তন হয়েছিল মানুষের মনের, তার সমাজব্যবস্থার, তার মূল্যবোধের। এত বড় পরিবর্তন এর আগেই পৃথিবীতে আর কোনদিন হয়নি। বিশ্বময় এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতকে বোঝার জন্য আমরা এই এককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ব।

৪(গ).১ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দী ছিল বিস্ময়করভাবে যুদ্ধের শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছিল (১৯১৪-১৯১৮ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫)। মনে রাখতে হবে যে এই যুদ্ধ দুটি ছিল মূলত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিজেদের যুদ্ধ যা তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে। আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হয়ে দাঁড়ায় কোন কোন দেশের পক্ষে শান্তি চেয়ে বড় ঐতিহ্য—কোন কোন মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। একজন পুরানো দিনের ঐতিহাসিক এই ব্যাপারটি অনুধাবন করে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যা মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির এই যুদ্ধবাজ মানসিকতাকে বড় সুন্দর করে তিনি বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে উনিশ শতকের ইউরোপের দেশগুলি — সে স্বৈরাচারী হোক আর গণতান্ত্রিক হোক—বিশ্বাস করত যে যুদ্ধ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। ফরাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাণীটি যুদ্ধের দ্বারাই তাড়িত হয়েছিল। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারকে রুখে দিয়েছিল যুদ্ধ। যুদ্ধের মাধ্যমেই ইটালী ও জার্মানির ঐক্য সাধিত হয়েছিল। এই একই মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র তার ফেডারেশন গড়তে পেরেছিল। এই পথ ধরেই পাশ্চাত্য প্রবেশ করেছিল প্রাচ্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে। ["The nations of the nineteenth century, whether autocratic or democratic, believed that war was an effective political weapon. War had propagated French political freedom, war had cheeked the tyranny of a Napoleon, by that means Italy and Germany had found nion, the united states justified federation, by the same path the West had entered into the wealth of the East."—D.M.Ketelbey, A History of Modern Times From 1789 to The Present Day] মোটের উপর একটা যুগ তৈরি হয়েছিল যে যুগ

মনে করত যে যুদ্ধ হচ্ছে একটা প্রযোজনীয় অস্ত্র। এই অস্ত্রকে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯১৪ সালে যে প্রায় সারা পৃথিবীই যুদ্ধের আওতায় এসে পড়েছিল। বাদ পড়েছিল শুধু নেদারল্যান্ডস্ ও তার সাম্রাজ্য। **নেদারল্যান্ডস্ ঃ** ওলন্দাজ ভাষায় বলা হয় নেডারল্যান্ড (Nederland) বা নিম্নভূমি। ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য যার আয়তন হল ১২,৫৩০ বর্গ মাইল। এই আয়তনের এক তৃতীয়াংশ সমুদ্র সমতলের নীচে অবস্থিত। সেইজন্য তাকে বলা হয় নিম্নভূমি— Nederland— ইংরাজি ভাষায় Netherlands। এক সময়ে বেলজিয়াম রাজ্য (Kingdom of Belgium) এর লুক্সেমবুর্গের রাজ্যকেও (Grand Duchy of Luxemburg) নেদারল্যান্ডসের অন্তর্ভুক্ত ধরা হত। নেদারল্যান্ডস্ রাজ্যের দুটি বড় প্রদেশ হল (এর মোট প্রদেশ এগারোটি) উত্তর হল্যান্ড ও দক্ষিণ হল্যান্ড (North Holland and South Holland)। এই দুই প্রদেশের নাম থেকেই সম্পূর্ণ রাজ্যটিকে হল্যান্ড বলা হয়। স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, কলোম্বিয়া, জেনেজুয়েলা এবং মেক্সিকো। পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধই হল প্রথম যুদ্ধ যেখানে শুধু পেশাদারী সৈন্য ও নৌবাহিনীই লড়াই করেছিল তা নয়, এক দেশের ও একজাতির মানুষ সামগ্রিকভাবে লড়াই করেছিল আরেক দেশ ও আরেক জাতির মানুষের সঙ্গে। আর তার সঙ্গে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ব্যবহৃত হল এক সঙ্গে বহু মানুষ ধ্বংস করতে পারার অস্ত্র (weapons of mass slaughter)। এই যুদ্ধে সরাসরিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া যারা নিজেদের মধ্যে একটি অলিখিত মৈত্রী বন্ধন (যাকে বলা হয় আঁতাত বা entente) রচনা করেছিল। তাদের সমর্থ করেছিল জাপান (১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে), ইটালী (১৯১৫ সালের মে মাস থেকে) এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে)। যুদ্ধের যে কোন বিষয়ে এদের মিত্র শক্তি বা Allied Powers বলে বর্ণনা করা হয়। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল দুই ইউরোপের কেন্দ্রগত শক্তি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক ১৯১৫ সালে বুলগেরিয়া তাদের সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয়।

৪(গ).২ প্রারম্ভিক কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে কোন প্রারম্ভিক আলোচনায় বুঝতে হবে মিত্রশক্তি (Allied Powers) ও কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের (Central Powers) সুবিধা-অসুবিধা কি ছিল যা নিয়ে তারা যুদ্ধের প্রাথমিক ঘটনাবলীর মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। ভৌগোলিক ভাবে মিত্রশক্তি ছিল অনেক ছড়ানো ও বহুধা-বিভক্ত শক্তি। তাতে মনে হতে পারে যে এর দ্বারা মিত্রশক্তির সুবিধাই হয়েছিল কারণ এতগুলি বান্ধব রাষ্ট্র পরিকল্পিত ভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিদের বেষ্টন করে রাখতে পারত। বিপক্ষ শক্তিকে ঘিরে ফেলা যে কোন অর্থেই যুদ্ধের সাফল্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। বাস্তবে অবশ্য তা কখনোই হয়নি। মিত্রশক্তির বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান তাদের পক্ষে একটি পরিকল্পনা মাফিক সাধারণ কাজ (Common action) করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিত্রশক্তির যেমন কোন সাধারণ লক্ষ্য ছিল না, সেরকম ছিল না একজন সর্বোচ্চ সেনাপতি। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ প্রথম থেকে সুপরিকল্পিত কার্যবিন্যাসের ছবিটি তুলে ধরতে পেরেছিল—পূর্ব পরিকল্পনামাফিক আক্রমণকে আগের থেকে সাজিয়ে তোলা রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে সফল করার সমস্ত দক্ষতাও তারা দেখিয়েছিল। আসলে প্রথমদিকে মিত্রশক্তির আয়জন ছিল শ্লথ, তাদের গতিবিধি (movements) ছিল অসংগঠিত (irregular) এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (ill-timed)। বিশেষ করে রাশিযা তার সৈন্য সঞ্চালনে এবং তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অসম্ভব দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দিয়েছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া প্রথম থেকেই অত্যন্ত দ্রুত

তাদের সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা দেখিয়ে অতি অল্প সময়ে অল্প সংখ্যক সৈন্যব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষার যে ছবিটি তুলে ধরেছিল তা প্রথম পর্বে যুদ্ধের সাধারণ ধারার মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। বস্তুতপক্ষে—ঐতিহাসিকরা মনে করেন কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সংগঠন ও স্ট্র্যাটেজি এতই সরল ছিল যে যুদ্ধের প্রথম দিকে লড়াই করার মূল উদ্যোগ (initiative) এবং যুদ্ধের কর্মতৎপরতার প্রধান ধারা (Lines of operation) তাদের হাতেই ছিল।

কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি জানত যে তাদের এই প্রাথমিক সাফল্য মাত্র সাময়িক। তাদের বিপক্ষের শক্তিরা এত ছড়ানো, এত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নৌবহরে এত শক্তিশালী যে বেশীদিন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি মিত্র শক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠন ও স্ট্র্যাটেজিকে প্রতিরোধ দিতে পারত তবে তাদের মধ্যে বিরোধহীন এমন এক সাধারণ ঐক্য গড়ে উঠত। এমন এক কেন্দ্রীয় সাধারণ (common) ও সর্বোচ্চ (supreme) নেতৃত্ব গড়ে উঠত যার মোকাবিলা করা অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও জার্মানির পক্ষে সম্ভব হত না। তাই প্রথম কেন্দ্রীয় শক্তি বর্গের লক্ষ্য ছিল অতি দ্রুত কাজ করা যাতে মিত্রশক্তি সংগঠিত হয়ে তাদের সমস্ত রসদ ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শক্তিদের পূর্ব পশ্চিম থেকে ঘিরে ফেলতে না পারে। কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী—প্রথম থেকে চেষ্টা করেছিল যাতে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বিপরীত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। মিত্রশক্তি যে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গকে ঘিরে ফেলে যুগপৎভাবে তাদের পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে তাদের লড়াইয়ের সামর্থকে নষ্ট করে দেবার পরিকল্পনা করবে এ কথা অনুমান করেই তারা আগে থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে নিজেদের জয়কে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার চেষ্ট করেছিল। অতএব তাদের পরিকল্পনা ছিল সমস্ত শক্তি দিয়ে ফ্রান্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিস্তেজ করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে যুদ্ধের থেকে হটিয়ে দেওয়া যাতে পূর্ব দিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করার আগেই পশ্চিম সীমান্তকে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তাহলেই পশ্চিম সীমান্তের সফল জার্মান সৈন্যদের তারা পূর্ব সীমান্তে আনতে পারবে—সম্ভাব্য রুশ আক্রমণকে ঠেকাতে পারবে।

৪(গ).৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত

১৯১২-১৩ সালে দুটি বলকান যুদ্ধ (Balkan Wars)— একান্তভাবেই আঞ্চলিক দুটি যুদ্ধ ছাড়া মোটামুটিভাবে ১৮৭১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সামান্য অধিক চার দশক সময় ছিল ইউরোপের শান্তির সময়। শুধুমাত্র ১৮৭৭ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও বড় মাপের কোন শান্তি বিঘ্ন হওয়ার ঘটনা এই সময়ে ঘটেনি। তা সত্ত্বেও ইউরোপের ছয়টি 'বৃহৎ শক্তির' (Great Powers) মধ্যে উত্তেজনা বহাল ছিল এবং ভেতরে ভেতরে তা বাড়ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা বা আঁতাত (Entente) গঠন করে একটা মিত্র শক্তির জোট রচনা করেছিল। অন্যদিকে জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও ইটালী নিজেদের মধ্যে একটি ত্রিশক্তির জোট তৈরি করে ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যভাগের একটি কেন্দ্রীয় শক্তি জোট রচনা করল। এই দুই জোটই ইতিহাসে ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) ও ট্রিপল্ এলায়েন্স (Triple Alliance) নামে বিখ্যাত। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই সমস্ত ইউরোপ দুটি সশস্ত্র শিবিরে (armed camps) বিভক্ত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই শিবির

ভাগের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়নি। ১৮৯০ পর্যন্ত বিসমার্ক (Bismarck) জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন। তিনি এই ধারণা প্রচার করেছিলেন যে জার্মানি হচ্ছে 'তৃপ্ত রাষ্ট্র' (Satiated State)। এতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে জার্মানি বাহুবলে আর মহাদেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবে না। শুধুমাত্র ফ্রান্স ১৮৭০ সালের সেদানের যুদ্ধে জার্মানির হাতে পরাজিত হয়ে এবং তাকে আলসাস-লোরেন নামক অঞ্চলের ভূখণ্ড ও মানব-সম্পদকে প্রদান করে যে নিঃসীম অপমানের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল তার থেকে মুক্তি খোঁজা, এবং সেই খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া তার পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না। ইংল্যান্ড এই সময়ে এক স্ব-আরোপিত নিঃসঙ্গতার (isolation) মধ্যে মগ্ন ছিল। ফলে হঠাৎ করে ঝড় ওঠার কোন সম্ভাবনা তখন ইউরোপীয় রাজনীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

বিসমার্ক সতর্ক কূটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডকে কোনভাবে অসন্তুষ্ট করেননি বা বিচলিত হতে দেননি। ১৮৭০ সালে জার্মানির ঐক্যভবনের ফলে ইউরোপে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা ধরে নিয়ে তিনি মহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ১৮৯০ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জার্মান বৈদেশিক কূটনীতির সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম (Kaiser William II)। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। তাঁর স্বপ্ন ছিল জার্মানিকে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি শুধু নয় একটি বিশ্ব শক্তিতেও রূপান্তরিত করা। বিসমার্ক জার্মানিকে একটি বৃহৎ মহাদেশীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন, তাকে বিশ্বশক্তি করার বাসনা তার ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে তারা দ্বারা ইউরোপের সনাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নাড়া খাবে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, জার্মানির জন্য তিনি বহির্বিশ্বে উপনিবেশ খুঁজছিলেন এবং বিসমার্কের 'তৃপ্ত রাষ্ট্রের' নীতিকে পরিহার করে তিনি দুর্বার অগ্রগতির—তাঁর ভাষায় Full steam Ahead—এর কথা বলতেন। উপনিবেশ দখলের স্বপ্ন দেখার অর্থ হল নিজের নৌ-শক্তিকে বৃদ্ধি করা যার অর্থই হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের—বিশেষ করে ইংল্যান্ডের—সাথে নতুন করে সামরিক, বাণিজ্যিক ও নৌশক্তির প্রতিযোগিতায় যাওয়া। বিসমার্ক জানতেন যে এ প্রতিযোগিতার অর্থ হল বিশ্বশক্তির পুনর্বণ্টন—একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় 'nothing less than a readjustment of world-power'। তাই তিনি তা এড়াতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদ্বয় ডেরি ও জার্মান [T.K. Derry and T. L. Jarman, The European world 1870-1961, 1965, p. 150] বলছেন যে যখন বিসমার্কের সাধারণ বুদ্ধিজনিত প্রভাব (common-sense influence) যখন অপসারিত হল তখন জার্মানির সনাতন 'জাতীয় চেতনা শক্তির জন্য শক্তির বোধ' ('national cult of power for power's sake') উজ্জীবিত হল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জার্মানি তার সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কঠিন শৃঙ্খলা ও দৃঢ় কার্যপ্রণালী এবং সফল বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকে লব্ধ রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ("For Germany in the early Twentieth Century was above all a land of economic prosperity and self-confidence, based upon a discipline and hard work in all classes of society and the skilful exploitation of political strength for commercial advantage"—Derry and German, p. 151)। জার্মানির ভেতরে আত্মপ্রকাশ করেছিল অর্থনৈতিকভাবে সফল ও আত্মপ্রত্যয়শীল দেশ। এই দেশের কর্ণধার ছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। তিনি এই নবোদিত শক্তির উদ্যোগকে বৈদেশিক গৌরব অর্জনের কাজে লাগাতে চাইছিলেন। ইউরোপীয় মহাদেশে সমস্ত দেশ ও জাতির মনে জার্মানির লৌহশক্তি, বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ নীতি' ('Blood and iron policy') আতঙ্ক জাগিয়েছিল। এবার কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের

সাম্রাজ্যবাদী নীতি নতুন আশঙ্কার সৃষ্টি করল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন যে এটি সবচেয়ে জঘন্যতম আশঙ্কা— অনিশ্চিতের আশঙ্কা—It was the worst kind of fetar : fears of the unknown (Brett)। কাইজারের অস্থির শক্তি কোন দিকে ধাবিত হবে কেউ জানতনা। অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত জাতি নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল। প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এই পরিবেশে যে কোন বিশ্ববিবাদের মীমাংসা যে আর অস্ত্র ছাড়া হবে না তা বোঝাই যাচ্ছিল। আপাত শান্তির অন্তরালে এইভাবে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

৪(গ).৪ বলকান জাতীয়তাবাদ

ইউরোপের পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে নানা জাতির মানুষ বাস করত। এদের মধ্যে ছিল মেজর (magyar—উচ্চারণ 'মেগিয়ার' নয়), চেক, সার্ব শ্লোভ্যাক, ক্রোট ইত্যাদি মানুষ যারা সবাই ছিল এথ্নিক (ethnic) বিভাজনে স্ল্যাভ (slav) জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কোন কোন মানুষ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল, কেউ ছিল তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত মানুষ। উনিশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এই সব মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ইউরোপে নেপোলিয়নের সময় থেকেই জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এইবার জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের স্ল্যাভজাতির মানুষদের গ্রাস করল। জাতীয়তাবাদ ছিল উনিশ শতকের নতুন আত্মচেতনা, আর এই আত্মচেতনাই বলকান অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অঞ্চল করে তুলল। বলকান অঞ্চলের মানুষরা ছিল বেশীরভাগই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের আনুগত্য ছিল পূর্বের অর্থডক্স চার্চের (Eastern Orthodox Church) প্রতি। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিনাশের পর এই চার্চের সবচেয়ে বড় ধারক ছিল রাশিয়া। আবার রাশিয়া ছিল সবচেয়ে বড় স্ল্যাভ রাষ্ট্র। ফলে বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষ ও দেশগুলির প্রতি রাশিয়ার একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের বিরোধের অনেক কারণের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। ১৮৯০ এর দশক থেকে যখন জার্মানি অটোম্যান সাম্রাজ্যকে মদত দিতে শুরু করল তখন থেকে বলকান জাতীয়তাবাদকে রাশিয়াও গোপন সমর্থন জানাতে লাগল। কাইজার দুইবার তুরস্ক ভ্রমণ করার ফলে তুর্কী-জার্মান দেয়া-নেয়া বাড়ছিল। স্থির হয়েছিল যে জার্মানির সহায়তায় ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, কনস্টান্টিনোপল হয়ে বসরা পর্যন্ত একটি রেললাইন পাতা হবে যে লাইন ইউরোপের বার্লিনকে যুক্ত করবে বাগদাদের সঙ্গে। এই রেল ব্যবস্থা সফল হলে পূর্ব দিকে জার্মানির প্রভাব বাড়ত এবং সুয়েজখালের বিকল্প রাস্তা খুলে দিয়ে পূর্বে পশ্চিম যোগাযোগের চাপিকাঠি ইংল্যান্ডের হাত থেকে জার্মানির হাতে চলে যেত। এইভাবে যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার ভয় ইংল্যান্ড গ্রাস করল তখনই ১৯০৮ সালে — তুরস্কে সংগঠিত হল তরুণতুর্কী বিপ্লব (Yound Turk Revolution)। তৎক্ষণাৎ এই বিপ্লবের ফলে বেসামাল তুরস্কের সামরিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের তিন মাস পরে বুলগেরিয়া (Bulgaria) স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বুলগেরিয়ার পেছনে রাশিয়ার মদত ছিল বলে তুরস্ক কিছুই করতে পারল না। তুরস্ক হয়ত অস্ট্রিয়ার সাহায্য নিতে পারত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার দুইদিন পরে অস্ট্রিয়া বসনিয়া (Bosnia) ও হার্জেগোভিনা (Harzegovina) দখল করে নিল। এই কাজের দ্বারা দুটি দেশই ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করল। কারণ এই চুক্তিতে বলা ছিল যে বুলগেরিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা আইনত তুরস্কের অধীনে থাকবে। অবশ্য এ কথাও তাতে বলা ছিল যে শেষোক্ত দুটি দেশের প্রশাসন থাকবে অস্ট্রিয়ার অধীনে। হয়ত ১৯০৮

সালের ঘটনাবলী নিয়েই যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। কিন্তু ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা কেউই প্রস্তুত ছিল না। সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রইল।

অস্ট্রিয়ার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল বলকান অঞ্চলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই দুই অঞ্চলের মানুষ জাতিগতভাবে সার্বদের (Serbs) অন্তর্ভুক্ত মানুষ ছিল। আর সার্বরা অনেকদিন ধরেই এক 'বহত্তর সার্বিয়া' (Greate Serbea) গঠনের স্বপ্ন দেখছিল। মূল সার্বিয়া ও পরিপার্শ্বের সমস্ত সার্বদের নিয়ে এই বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনের পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। অস্ট্রিয়ার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখলের ফলে এই বৃহত্তর সার্ব রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে এর পর থেকে ইউরোপীয় মহাদেশের এক কেন্দ্রীয় শক্তি—অস্ট্রিয়া—যে কোন সার্বসম্প্রসারণের নীতিকে প্রতিরোধ করবে। এর ফলে বলকান অঞ্চলের মানুষদের অস্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেল। বলকান জাতীয়তাবাদ আরও তীব্রতর হল। স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রিয়া ও তার শাসকবর্গ সম্বন্ধে নানা উত্তেজনাকর মত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এরপর থেকে স্পষ্ট করেই বলকান জাতীয়তাবাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল একদিকে অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে তুরস্ক। তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান জাতীয়তাবাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল একদিকে অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে তুরস্ক। তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান জাতীয়তাবাদের উত্থান আঞ্চলিক যুদ্ধ ডেকে এনেছিল—তা হল ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধ। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বলকান বৈরিতা ডেকে এনেছিল বৃহত্তর যুদ্ধ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

৪(গ).৫ আন্তর্জাতিক সংকট ঃ হেগ কনফারেন্স থেকে বলকান যুদ্ধ

১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে যে অধ্যায় তা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অনিশ্চিত অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি। আপাতভাবে বিরাজমান শান্তির মধ্যে ছিল প্রত্যাসন্ন যুদ্ধের আশকা। যে বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা ও সাফল্য (scientific thoroughness and efficiency) নিয়ে এশিয়ার সামরিক যন্ত্র তৈরি হয়েছিল যা জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল তা ইউরোপের প্রত্যেক দেশের মধ্যে যুগপৎভাবে উৎসাহ ও আশঙ্কা জাগিয়ে তুলে আন্তর্জাতিক সংকটের বাতাবরণকে ঘনীভূত করে তুলেছিল। সবাই উৎসাহিত হয়েছিল তাদের সামরিক শক্তিকে নবকলেবরে সুসজ্জিত করতে, বৈজ্ঞানিক পূর্ণতায় নিজেদের বাহুবলকে এমন দক্ষতা দিতে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে ইউরোপ আগে যা হয়নি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আক্ষরিক অর্থে হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি সশস্ত্র মহাদেশ ("Europe became in the last quarters of the nineteenth Century what she had never been before, literally an armed continent"—Charles Oman Hazenn, *Modern Europe upto 1945*)। জাতির সঙ্গে জাতির বৈরিতার থেকে জন্ম নিচ্ছিল ভিন্ন এক প্রতিযোগিতা—মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা, দুর্ভেদ্য নৌবহর ও শক্তিশালী সামরিক মানবশক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা। তৈরি হচ্ছিল মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র—টর্পেডো ও টর্পেডোবাহী জলযান—আর তৈরি হচ্ছিল সেই সব ক্ষেপণাস্ত্রকে আড়াল থেকে অকেজো করার যন্ত্রে, জলের তলে আক্রমণ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জলযান সাবমেরিন। এর পরেই এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল অন্তরীক্ষে লড়াইয়ের যন্ত্র চালানো যায় এমন বেলুন (dirigible balloons) ও বিমান। এইভাবে যুদ্ধ নামক মানুষের প্রাচীনতম প্রবণতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন সমর্থন যুক্ত হতে লাগল। এইবার যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল তা অভূতপূর্ব। এতদিন যুদ্ধ হয়েছে মাটি বা জলের উপর। এবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল আকাশে ও জলের নীচে, গভীরে, গহনে। ইউরোপে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাষ্ট্র

ছিল রাশিয়া। সামরিক শক্তিকে আধুনিকীকরণের কাছে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার ছিল না কারণ সে কাজ ছিল ভয়ানক ব্যয়সাধ্য। অতএব রাশিয়ার মনেই এই ধারণা প্রথম এল যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার থেকে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা, পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি নিয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। অতএব রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রস্তাব করলেন যে পরস্পরের আলোচনার ভিত্তিতে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি অস্ত্রসংকোচনের নীতিগুলি নির্ধারণ করুক। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালে হেগ নামক স্থানে দু'বার শান্তি সম্মেলন হয়েছিল। প্রথমবারের সম্মেলনে পৃথিবীর ছাব্বিশটি সার্বভৌম সরকারের একশত জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ২০টি দেশ হল ইউরোপের ৪টি দেশ (চীন, জাপান, পার্সিয়া বা পারস্য দেশ এবং শ্যাম দেশ) এশিয়ার ও ২টি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো) দেশ আমেরিকার। এই সম্মেলন দুটি ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু প্রথম সম্মেলন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল স্থায়ী সালিসী আদালত— Permanent Court of Arbitration— নামে একটি আন্তর্জাতিক বিচার সংস্থা। স্থির হল যে আন্তর্জাতিক বিবাদ সাধারণ কূটনীতির দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব নয় তা এই বিচার সংস্থার দ্বারা মীমাংসিত হবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রেনে আলব্রেকত-করিয়ে (Rene Albrecht-Carrie', *A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna*) বলেছেন যে অস্ত্র সংকোচন নিয়ে আহূত প্রথম হেগ শান্তি সম্মেলন সালিসী ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত মতৈক্য ছাড়া আর কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি ("This first Hague conference on the limitation of armaments yielded nothing more than a limited agreement on arbitration")। দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন ও অস্ত্রসংকোচনের কোন নীতি স্থির করতে পারল না। যুদ্ধ সংক্রান্ত কতগুলি নীতি শুধু স্থির হয়েছিল যেমন অরক্ষিত শহরের (unfortified towns) উপর বোমাবর্ষণ করা যাবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় হেগ শান্তি সম্মেলনের একমাত্র কৃতিত্ব হল যুদ্ধকে একটু মানবিক সীমার মধ্যে আটকে রাখা—একজন ঐতিহাসিকের ভাষার "to ensure that war would be waged more humanely than hitherto"। রাশিয়ার জার দুঃখ করে বলেছিলেন যে শান্তি সংরক্ষণকেই আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। অথচ এর নামে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে শক্তিশালী মৈত্রী রচনা করছে ("The preservation of peace has been put forwared as the object of international policy. In its name the great states have concluded between themselves powerful alliances")। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির কাছে তখন শান্তির কথা হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক লিপসন বলেছেন যে মহাদেশের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির একটা বিষাক্ত চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। তারা সবাই শান্তির ঘোষণা করত কিন্তু ভয় পেত প্রতিবেশীকে—ভাবত অস্ত্রের পর অস্ত্র জড়ো করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সবল হচ্ছে। এই আশঙ্কায় প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করত। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে—রাশিয়ার জার দুঃখের সঙ্গে লিখলেন—তবে অনিবার্যভাবে সেই বিপর্যয় নেমে আসবে যে বিপর্যয় এড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে ("It appears evident, then that if this state of things continues, it will inevitably lead to the very cataclysm which of is desired to avert, and the horrors of which make every thinking being shudder in anticipation"—দ্রষ্টব্য Holls, *The Peace Conference at the Hague*, p.8)। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে পারল না তার অর্থই হল অন্তরালে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এইরকম আসন্ন যুদ্ধের পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল দুবার—১৯০৬ ও ১৯১১ সালে মরোক্কোর সংকটে এবং ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধে। এই দুই সংকটের ইতিহাস সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল।

মরোক্কোর সংকট, ১৯০৬, ১৯১১

ফরাসীরা ১৯০২ সালে ইটালীর সঙ্গে তাদের চুক্তির দ্বারা এবং ১৯০৪ সালের ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাদের আঁতাতের দ্বারা মরোক্কোতে (Morocco) স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপের অধিকার পেয়েছিল। এবার তারা স্থির করল যে মরোক্কোর সুলতানকে একটি সংস্কারের কর্মসূচি (scheme of reforms) গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তৎক্ষণাৎ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই বৃহত্তর কাজে জার্মানিকে গ্রহণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে মরোক্কোর স্বাধীনতা রক্ষায় জার্মানির সহযোগিতা ঘোষণা করলেন। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ট্যাঞ্জিয়ারে (Tangier) ভ্রমণকালে এই ঘোষণা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাবী করেন যে মরোক্কোর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলি একটি আলোচনা সভায় মিলিত হোক। এদিকে মরোক্কোর সুলতান জার্মানির সহযোগিতায় আশ্বস্ত হয়ে ফরাসী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আলজেসিরার্স (Algesriras) নামক স্থানে একটি আলোচনা সভায় স্থির করে যে মরোক্কো হবে একটি স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু বাণিজ্যের জন্য সমস্ত জাতির মানুষের কাছে তাকে উন্মুক্ত রাখা হবে। বারোটি রাষ্ট্র এই আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধু অস্ট্রিয়াই ছিল জার্মানির বন্ধু। আলজেসিরার্স সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কি হয়েছিল তা বড় নয়। বড় হল তার থেকে উদ্ভূত এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা যে জার্মানি নিঃসঙ্গ। বোঝা গেছিল যে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি জার্মানির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করতে পারে। জার্মানির কাইজার এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে পারেনি।

মরোক্কোর ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বড় ঘটনা কারণ তা ফ্রান্স ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী চেতনাকে উস্কে দিয়েছিল। আসলে মরোক্কো ছিল অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় স্বাধীন একটি রাজ্য যেখানে পরিস্থিতি ছিল বেসামাল—এতই বেসামাল যে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ও জার্মানি তাকে গ্রাস করার কথা ভাবত। মরোক্কোয় অবস্থানরত ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল (Consul General) আর্থার নিকোলসন (Arthur Nicolson) বলেছিলেন যে মরোক্কো হচ্ছে "উত্তাল উপজাতিদের, দুর্নীতি পরায়ণ শাসকদের এবং দারিদ্র ও দুর্দশার একটি অসম্বন্ধ সম্মেলন" (a "loose agglomeration of turbulent tribes, corrupt governors, and general poverty and distress")। এইরকম মরোক্কোতে ১৯০৮ সালে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য সেখানকার সুলতান সিংহাসন-চ্যুত হলেন। নতুন সুলতান দেশের ভেতরের গোলযোগ দমন করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯১১ সালে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র আলজেরিয়াতে (Algeria) অবস্থিত তার মিত্রশক্তি ফরাসীদের আহ্বান জানালেন যে তারা যেন তাঁর রাজধানী ফেজ-এ (Fez) এসে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করে। ফরাসীরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তৎক্ষণাৎ তারা ফেজ-এ তাদের সৈন্য প্রেরণ করে। এই ঘটনায় জার্মানি ক্রুদ্ধ হল। রুষ্ট কাইজার তৎক্ষণাৎ মরোক্কোর বন্দর আগাদির-এ (Agadir) প্যান্থার নামে একটি যুদ্ধ জাহাজ (Panther) প্রেরণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৌশলে মরোক্কোর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখল করা। আর তা সম্ভব না হলে অন্তত ফ্রান্সকে মরোক্কোয় নিজের প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত করা। জার্মানির এই কাজে ইংল্যান্ড বিরক্ত হল এইভেবে যে জার্মানি তার নৌ-বাহিনীর পরাক্রম দেখিয়ে এমন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করছে যেখানে ইংল্যান্ডের স্বার্থ জড়িত। জার্মানির নৌ-পরাক্রমকে ইংল্যান্ড মহাসমুদ্রে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে করত। অতএব আগাদির এ জার্মান রণতীরর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের লয়েড জর্জ (Loyd George) ঘোষণা করলেন যে বহু শতব্দীর-দুর্লভ কৃতিত্বের দ্বারা ইংল্যান্ড যে সমস্ত সুবিধা অর্জন করেছে তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, বিশ্বের রাষ্ট্র সমাজে ইংল্যান্ডকে উপেক্ষিত হতে হলে ইংল্যান্ড কখনোই সেই মূল্য দিয়ে শান্তি ক্রয় করবে না ("...I say emphatically that peace at that price would be humiliation intolerable for a great country like ours to

endure")। এইভাবে হঠাৎ করে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দিল। ফলে সমস্ত আলজেসিরার্স কনভেনশনভুক্ত (Algeciras Convention) দেশগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হল। পরিশেষে স্থির হল যে মরোক্কোকে ফরাসী প্রটেক্টরেট (French Protectorate) বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে কিন্তু সকল দেশের বাণিজ্যের জন্য তাকে উন্মুক্ত রাখা হবে। জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্স কঙ্গো অঞ্চলে ভূখণ্ডদান করবে। জার্মানি আগাদির সংকট তৈরি করে কূটনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson, *Europe since Napoleon*) বলেছেন যে আগাদির সংকটের প্রধান ফল হল এই যে ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মহাসাগরে আধিপত্য বজায় রাখার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেল, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাস বাড়ল। উভয় দেশের জনমত উত্তেজিত রইল। জার্মানি কঙ্গোতে ১০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডলাভ করল। বেশ বোঝা গেল যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শেষ হয়ে যায়নি।

২. বলকান যুদ্ধ : ১৯১২, ১৯১৩

১৯২২ সালে গ্রীক রাষ্ট্রনেতা ভেনিজেলস (Venezelos) একটি রাষ্ট্র সংহতি গঠনের উদ্যোগ নেন এবং গ্রীস, সার্বিয়া (Serbia) বুলগেরিয়া (Bulgaria) ও মন্টেনিগ্রোকে নিয়ে বলকান লীগ নামে একটি রাষ্ট্র জোট গঠন করেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসিডেনিয়ায় অবস্থিত খ্রীস্টানদের জন্য অধিকতর সুবিধা ও অধিকার আদায় করা। ১৮৭৮ সালের বার্লিনচুক্তি অনুযায়ী ম্যাসিডোনিয়া তুর্কী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব বলকান লীগ তুরস্কের কাছে সরাসরি এই দাবী পেশ করল।

বলকান রাষ্ট্রগুলি কেন এই সময়ে জোট বাঁধল এবং তুরস্কের সঙ্গে সরাসরি বৈরিতায় অগ্রসর হল তার একটি প্রেক্ষিত আছে। ১৯১১ সালে ইটালী ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চল ট্রিপোলি (Tripoli) আক্রমণ করে এবং বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে নিজের দখলে রাখে। দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্য নিজের রাজ্যাংশ রক্ষা করতে না পেরে অবশেষে ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর লোসনা চুক্তির (Treaty of Lausanne) বা ঔচি-চুক্তির (Treaty of Ouchi) দ্বারা ট্রিপোলিকে ইটালীর হাতে সমর্পণ করে। ইটালী টিউনিস (Tunis) দখল করতে পারেনি, তার আগেই ফ্রান্স তা দখল করে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড মিশর দখলের কাজ সম্পন্ন করে ফেলছিল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নিয়েছিল। ১৯০৮ সালে বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কোন ক্ষেত্রেই দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্য কোন প্রতিরোধ দিতে পারেনি। এমনকি কোন বৃহৎ শক্তি ও এই তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বসে যাওয়া প্রতিরোধ করতে নিজেদের প্রতিরক্ষা বা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। অতএব এটাই ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রকৃষ্ট সময়।

এই পরিস্থিতিতেই বলকান লীগ তুরস্কের কাছে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীস্টানদের জন্য অধিকতর সুযোগ-দাবী করল। দীর্ঘদিন ধরে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীস্টান অধিবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার করছিল অটোমান সাম্রাজ্যের মুসলমান শাসকরা। সময় সময় বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হত। আর এই হত্যালীলায় যারা বলি প্রদত্ত হত তাদের মধ্যে গ্রীক, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ইত্যাদি জাতিভুক্ত মানুষরাই ছিল বেশি। অতএব এই দেশগুলির মানুষেরা চাইছিল মন্টোনিগ্রোতে অবস্থিত তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উদ্ধার করতে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তুরস্কের কাছে তাদের দাবী পেশ করা হয়েছিল। এই দাবী তুরস্ক সরাসরি অস্বীকার করে। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে বলকান লীগভুক্ত রাষ্ট্র চতুষ্টয় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। লীগের সেনাবাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করল। ডিসেম্বর মাসে বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্কের উপর আরোপ করছিল তা মেনে নিতে তুরস্ক

অস্বীকার করল। ফলে ১৯১৩ সালে আবার যুদ্ধ শুরু হল এবং লীগের সৈন্য বাহিনী পুনরায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করল। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে জোট বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের (Constantinople) পঁচিশ মাইলের মধ্যে চলে এল। কনস্টান্টিলোপলের পতনের আশঙ্কায় তুরস্ক শান্তির প্রস্তাব দিল। লন্ডনের চুক্তি (Treaty of London) দ্বারা বলকান যুদ্ধ সমাপ্ত হল। লন্ডন চুক্তির দ্বারা তুরস্ক তার সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যাংশ হারাল। তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া রাজ্যাংশ বলকান রাষ্ট্রগুলিকে দান করা হল। আলবেনিয়াও এরপর থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। সার্বিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও আলবেনিয়াকে স্বাধীন করা হয়েছিল। সার্বিয়া অনেকদিন ধরেই একটি উপকূল রেখা চাইছিল যাতে একটি অভ্যন্তর রাষ্ট্র (inland state) হিসাবে তার বন্ধ দশা ঘোচে। তাই তার ইচ্ছা ছিল সে এবং মন্টেনিগ্রো উভয় মিলে আলবেনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাতে বাধ সাধল অস্ট্রিয়ার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। স্বদেশের বাইরেও সার্বদের মধ্যে ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। এই ক্ষোভ থেকে প্রাচ্যসমস্যা নতুন রূপ নেয়। এদিকে বলকান জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং বৃহৎ শক্তিগুলি অন্তরাল থেকে নানা ষড়যন্ত্রে মদত দিয়ে যুদ্ধের পরিবেশকে বাড়িয়ে যেতে থাকে। ১৯১৩ সালের জুন মাসে যুদ্ধ বাধে—একদিকে বুলগেরিয়া, অন্যদিকে সার্বিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া ও মন্টেনিগ্রো। যুদ্ধ বেশী দিন চলেনি কিন্তু সেই সুযোগে তুরস্ক তার কিছু হৃতরাজ্যাংশ অধিকার করে নেয়। প্রাচ্য সমস্যা থেকে মহাদেশীয় যুদ্ধ হতে পারত। কিন্তু সাময়িকভাবে তা স্থগিত রইল।

৪(গ).৬ ওয়েল্টপলিটিক ও নৌ-বাদ

১৮৯০ সালে বিসমার্কের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে জার্মান পররাষ্ট্রনীতিতে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা দেখা দিয়েছিল তা ইউরোপের রাজনীতিতে যুদ্ধের পরিবেশকে ঘনিয়ে তুলেছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম যে ওয়েল্টপলিটিক (Weltpolitik) ও নৌবাদের নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা ইউরোপীয় শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল। ওয়েল্টপলিটিক (Weltpolitik) হল 'বিশ্বনীতি' ('World policy') আর নৌবাদ (Navalism) হল নৌবাহিনীর বিস্তার ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বজলরাশির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। ঐতিহাসিক গর্ডন এ ক্রেইগ (Gordon a. Craig, Germany 1866-1945) ওয়েল্টপলিটিক, নৌবাদ (Navalism) ও বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাবকে সম্পৃক্ত ঘটনা বলে মনে করেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে এই তিন ঘটনার সমন্বিত প্রভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। ওয়েল্টপলিটিক বা বিশ্বনীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক জার্মান ঐতিহাসিক বলেছেন যে এর পর থেকে জার্মানি বিশ্বমুখীন হল। 'World-policy' বা 'বিশ্বনীতি'র অর্থ, তাঁর মতে, হল 'জার্মানি তার নীতি নির্ধারণে ক্রমে ক্রমে ইউরোপ মহাদেশকে ত্যাগ করল' ("Germany has by degrees ceased to regard exclusively the continent of Europe in framing her policy")। এই ইউরোপ ত্যাগ করে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার নীতি যে বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নে বিভোর সম্রাটের উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিত্ব থেকে উৎসারিত তা নয়। কিংবা কোন রাষ্ট্রবিদের (Statesman) উচ্চাভিলাষ ও অতিরিক্ত উৎসাহ থেকে সৃষ্ট এমন কথাও বলা যাবে না। একথাও বলা যাবে না যে রাজনৈতিক প্রভাবহীন অখিল জার্মান ঐক্যচিন্তায় মগ্ন কিছু মানুষের চাপের ফলেই তার সৃষ্টি। বিশ্বনীতির আদর্শকে বুঝতে হবে বিবর্তনের শক্তিশালী ধারায় যেখানে জার্মান রাষ্ট্র তার পুরানো নীতির সীমাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে ("...rather, if forms part of that strong tide of evolution which irresistibly bore the German State out beyond the bounds of its earlies policy"— পঠিতব্য *Cambridge Modern History,* XII,— এই খণ্ডে প্রাপ্য H. Oncken এর প্রবন্ধ

The German Smpile)। বিসমার্ক মহাদেশের মধ্যে জার্মান রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ রেখে অন্ততঃ এই বোধ তৈরি করতে পেরেছিলেন যে জার্মানি বহির্বিশ্বে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের কোন প্রতিযোগিতায় যাবে না। তাতে সনাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদির মনে কোন আশঙ্কার সৃষ্টি হয় নি। এইবার সেই আশঙ্কা ঘনীভূত হল। সমকালীন জার্মান রাষ্ট্রের একজন কর্ণধার প্রিন্স বুলো (Prince Bulow) স্বীকার করেছেন যে যখন বিসমার্কের পরবর্তী নীতিনির্ধারকরা বিসমার্কের মহাদেশীয় নীতির স্বীকৃত পথ ছেড়ে বিশ্বনীতির অনিশ্চিত পথে পা বাড়ালেন তখন "প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল" ("Voices were raised in protest")। এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে আজ হোক কাল হোক জার্মানির সহেগ ইউরোপের মহাশক্তিগুলির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই অনিবার্য সংঘাতকে বিসমার্ক এড়িয়ে গিয়েছিলেন। নেপোনিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলির জোট বাঁধার ইতিহাসকে সামনে রেখে জার্মানির এই 'লৌহ চ্যান্সেলর' (Iron Chancellor) বাড়াবাড়ি করার পথ থেকে বিরত হয়েছিলেন, শুধু তৈরি করেছিলেন ভিন্নতর এক জোট যাকে বলা যেতে পারে—লিপসন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ভাষায়—একটি আত্মরক্ষামূলক জোট। যদি কোন দিন ইউরোপীয় মহাশক্তিগুলির রোষ জার্মানির বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক রাষ্ট্র জোট গড়ে তোলে তবে ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance) হবে জার্মানির রক্ষাকবচ। ইংল্যান্ড এই ত্রিশক্তির মৈত্রীকে প্রতিরোধ করেনি কারণ জানত তা ইউরোপের শান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। দীর্ঘদিন ধরে জার্মান রাষ্ট্রচিন্তায় সামরিকতা প্রাধান্য পাচ্ছিল। বিসমার্ক তাঁর সামরিক জাতীয়তাবাদকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পেরেছিলেন সেহেতু মহাদেশীয় রাজনীতির কোন বিপর্যয় কোথাও দেখা যায় নি। কিন্তু এইবার ওয়েল্টপলিটিকের বা বিশ্বনীতির নতুন গতি যখন জাতীয়তাবাদের আত্মম্ভরি ভাবনাকে উস্কে দিল তখন জার্মান সামরিকতা হয়ে দাঁড়াল "রাজনৈতিক গোলযোগের সবচেয়ে গতিশীল শক্তি" ("the most dynamic force for political disturbance")।

ওয়েল্টপলিটিক (Westpolitik) এর নীতি যে সব মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের অন্যতম হল নৌবাদ (Navalism)। বিশ্বনীতি সার্থ করতে নৌবাহিনীর দরকার, আর নৌবাহিনী থাকলেই সমুদ্রে যাবার পথ দরকার হয়। ১৮৯৫ সালে কিয়েল ক্যানাল (Keil Canal) খননের মধ্য দিয়ে উত্তর সাগরে যাওয়ার নতুন পথ তৈরি হল। এরপর থেকে বাল্টিক অঞ্চলের বন্দরগুলি থেকে যে কোন জাহাজের পক্ষে উত্তর সাগরে যাওয়া সহজ হয়ে উঠল। ১৯০০ সালেই রচিত হয়েছিল জার্মান নৌ-আইন (German Navy Law)। এই আইন যে কোন মহাদেশীয় শক্তির নৌবহরের থেকে বড় নৌবহর তৈরি করার অধিকার দিল জার্মানিকে। সেই সময়কার সবচেয়ে বড় নৌশক্তি ব্রিটেনের কাছে এইটি ছিল আশঙ্কার বিষয়। যে চ্যালেঞ্জ বিসমার্ক কোনদিন ইংল্যান্ড জানাতে সাহস করেন নি সেই চ্যালেঞ্জ অনায়াসে ইংল্যান্ডের সামনে হাজির করার দুঃসাহস দেখালেন বিসমার্কের উত্তরাধিকারীরা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইংল্যান্ডের ছিল। সেই ক্ষমতার সুচারু সংগঠনের জন্য ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক মিত্রের। উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে ইংল্যান্ড সংরক্ষিত একাকিত্বের (isolation) মধ্যে ছিল। এই একাকিত্ব থেকে ইংল্যান্ড এইবার সরে এল। প্রথমে একটি এশিয় দেশ জাপানের সঙ্গে সে মিত্রতায় আবদ্ধ হল। পরে আঁতাত গঠন করল ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে। জার্মানির এই বিপজ্জনক বৈদেশিক নীতি ও নৌবাদের উদ্ভট চিন্তা যে শুধু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের মস্তিষ্ক প্রসূত তা নয়। এর পেছনে বিদেশমন্ত্রী বার্ণার্ড ভন বুলো (Bernard Von Birlow) এবং নৌ-মন্ত্রী গ্র্যান্ড এডমিরাল আলফ্রেড ফন টিরপিজ-এর (Grand Admiral Alfred Von Tirpitz) ভূমিকাও ছিল অনেক। বুলো একটি জবরদস্ত বৈদেশিক নীতিকে জার্মানির পালনীয় নীতি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমি বৈদেশিক নীতির উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিচ্ছি— "I am putting the main emphasis on foreign

policy। এ কথা তিনি বলেছিলেন ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর আরও জোর দিয়ে বললেন "শুধুমাত্র একটি সফল বৈদেশিক নীতিই পারে মেলাতে, শান্ত করতে, একজোট করতে, ঐক্যবদ্ধ করতে" ("Only a successful foreign policy can help to reconcile, pacify, rally, unite"—পঠিতব্য গ্রন্থ Rohl, *Germany without Bismarck*)। এইভাবে যখন বার্নার্ড ভন বুলো জবরদস্ত বৈদেশিক নীতির কথা বলেছেন তখন তিরপিজ (Tirpitz) মনে মনে স্থির করছেন যে ইংল্যান্ডই হচ্ছে জার্মানির সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক শত্রু আর পৃথিবীতে ইংল্যান্ডের এই প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য চাই যুদ্ধ জাহাজ। নৌবাহিনীর সফল অভিসার হিসাবে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বিশ্বাসে আরূঢ় করেছিল—এ কথা বলেছেন ঐতিহাসিক ক্রেগ ("... and the experience sums to have confirmed him in the belief, first that Great Britain was Germany's Chief enemy and second, that the necessary instrument for countering British influence in the World was the battleship"—Gordon A. Craig, Germany 1866-1945)। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে ইউরোপে দুটি শিবির আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে যে শিবিরের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শিবিরের নেতা, অন্যদিকে স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে পরিবর্তনের বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষায় অধীর একটি সংশোধনবাদী (Revisionist) শিবিরের নেতা জার্মানি। বিসমার্ক এই দুই শক্তিকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাননি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তাই করলেন।

৪(গ).৭ প্রাচ্য সমস্যা ঃ সেরাজেভো হত্যা কাণ্ড ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে বুখারেস্ট চুক্তির দ্বারা (Treaty of Bucharest) বুলগেরিয়ার সাথে অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। তুরস্ক অদ্রিয়ানোপল অধিকার করে নিয়েছিল এবং বুলগেরিয়া সেই বছর এপ্রিল মাসে লন্ডন চুক্তির দ্বারা যে সব অঞ্চলের অধিকার পেয়েছিল তা সব হারাল। সার্বিয়া আলবেনিয়া অধিকার করতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঠিকই কারণ কোন উপকূলরেখা সে লাভ করতে পারেনি। তবুও তার আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পরিপার্শ্বের স্ল্যাভদের মধ্যে তার প্রতিপত্তি প্রায় সীমাহীন হয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী তার প্রতিবন্ধক হলেও তার আরও প্রসারিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয়নি। অস্ট্রিয়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিল তার মিত্রশক্তি জার্মানি। জার্মানি চাইছিল না যে অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাক কারণ তাহলে বাগদাদ রেল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বার্লিন থেকে মেসোপটেমিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। আবার তুর্কী সাম্রাজ্য না ভাঙ্গালে সার্বিয়ার প্রভাব মণ্ডল বিস্তারের সম্ভাবনা স্তিমিত হয়ে যায়। পশ্চিম দিকে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অনড় প্রহরীর মত সার্বিয়ার উপর নজর রাখছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে এবং আলবেনিয়ার উপর সার্বিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হতে দিয়ে অস্ট্রিয়া সার্ব জনগণের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। এই প্রতিহিংসাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম প্রত্যক্ষ কারণ। কিভাবে এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়েছিল তা নীচে বর্ণনা করা হল।

অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শাসক ফ্রান্সিস জোসেফ (Francis Joseph) ১৮৪৮ এর বিপ্লবের সময় থেকে রাজত্ব করছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ (Archduke Francis Ferdiman)। তিনি ছিলেন উদার-নৈতিক মানুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল যখন তিনি শাসক হবেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত প্রজাদের মঙ্গালজনক একটি নতুন সংবিধান দান করবেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে তাঁর প্রজাদের অবস্থা দেখছিলেন। ১৯১৪ সালের জুন মাসে তিনি বসনিয়ায়

যান। ২৮ জুন রবিবার তিনি যখন বসনিয়ার রাজধানী সৌরাজেভোর (Serajevo) ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী ধরা পড়েছিল। দেখা গেল সে বসনিয়ার মানুষ, অতএব অস্ট্রিয়ার প্রজা। কিন্তু অস্ট্রিয়ার পুলিশ অনুসন্ধান করে জানল যে হত্যার ষড়যন্ত্র সংগোপনে সার্বিয়াতে করা হয়েছে এবং সার্বিয়ার সরকার পূর্বাহ্নেই তা জানত। অস্ট্রিয়ার সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ল সার্বিয়ার উপর। জার্মানির সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে এবং রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করলে সে কতখানি জার্মান মৈত্রীর উপর নির্ভর করতে পারবে তা স্থির করে ১৯১৪ সালের ২৩ জুলাই—ঘটনার প্রায় একমাস পরে—অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সার্বিয়াকে একটি চরম পত্র (ultimatum) দান করল। অস্ট্রিয়া জানত যে ১৯১১ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী সার্ব বিপ্লবীরা 'ঐক্য অথবা মৃত্যু' ('Unity or Death') নামে একটি চরমপন্থী দল তৈরি করেছিল। এরা 'কালো হাত' বা Black Hand নামেও পরিচিত ছিল। সৈন্যবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষ সবার মধ্যে এদের প্রভাব ছিল। এদেরই এক সদস্য যুবরাজকে হত্যা করে। অতএব অস্ট্রিয়া দাবি করল

১. সার্বিয়াকে সমস্ত অস্ট্রিয়া বিরোধী প্রচার ও কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে।

২. অস্ট্রিয়া যাদের নাম উল্লেখ করছে সেই সব অফিসার বা পদস্থদের চাকুরির থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৩. সেরাজেভোর যে আদালতগুলি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সেই আদালতগুলিতে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি থাকবে।

সার্বিয়াকে উত্তর দেওয়ার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। সার্বিয়া জানত তার উত্তরের উপর নির্ভর করবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি বা যুদ্ধ। এ কথা বুঝেই সার্বিয়া যতখানি সম্ভব অস্ট্রিয়ার দাবীপূরণের চেষ্টা করল। প্রথম দুটি দাবী সে তৎক্ষণাৎ মেনে নিল। তৃতীয় দাবী মেনে নিলে তার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হয়। অতএব তার প্রস্তাব হল যে সে আদৌ তার তদন্ত আদালতে বৈদেশিক কোন মানুষকে গ্রহণ করতে পারে কি না তা জানার মতামত জানা হোক। স্পষ্টতই সার্বিয়া তার যথাসাধ্য করেছে। এর বেশি কিছু করতে গেলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। একথা বুঝতে পেরে জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সংযত হতে পরামর্শ দিল। এর আগেও অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করতে চাইলে জার্মানি তাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল এবং অস্ট্রিয়াও জানত যে জার্মানির সাহায্য ছাড়া বলকান অঞ্চলে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে বড় ঝুঁকি নেওয়া হবে কারণ যে কোন সার্বশক্তির পেছনে আছে রাশিয়া, সেবার জার্মানির পরামর্শমত কাজ করলেও এইবার অস্ট্রিয়া ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল। সে জানত যে যদি কোন বড় যুদ্ধে সে জড়িয়ে পরে জার্মানি কিছুতেই আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। জার্মান সমর্থন সংকটকালে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে থাকবে এ কথা জানতে পেরেই গ্রাহ্য নয়। এই ঘোষণার সাথে সাথেই ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর আগের দিনই রাশিয়া ঘোষণা করেছিল যে সে সার্বদের সমর্থন করবে। অতএব ২৯ জুলাই রাশিয়া তার সৈন্য সঞ্চালন শুরু করল। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সমস্ত ইউরোপ যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়ল। এর সঙ্গে পৃথিবী অধিকাংশ দেশ যুদ্ধের আয়োজন ও সংগঠনে অংশীদার হয়ে উঠল। ইটালী শুরুতে তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল। বুলগেরিয়া যোগ দিল কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে। ৫১ মাস নিরন্তর যুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের প্রতিরোধ ধ্বসে যায়। ১৯১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মিত্রশক্তি বুলগেরিয়াকে যুদ্ধবিরতি দান করল। তুরস্ককে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হল ৩০ অক্টোবর, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে ৩ নভেম্বর এবং জার্মানিকে ১১ নভেম্বর।